ছোটগল্প

শারদ অর্ঘ্য

বিড়াল

রাহুল পণ্ডা

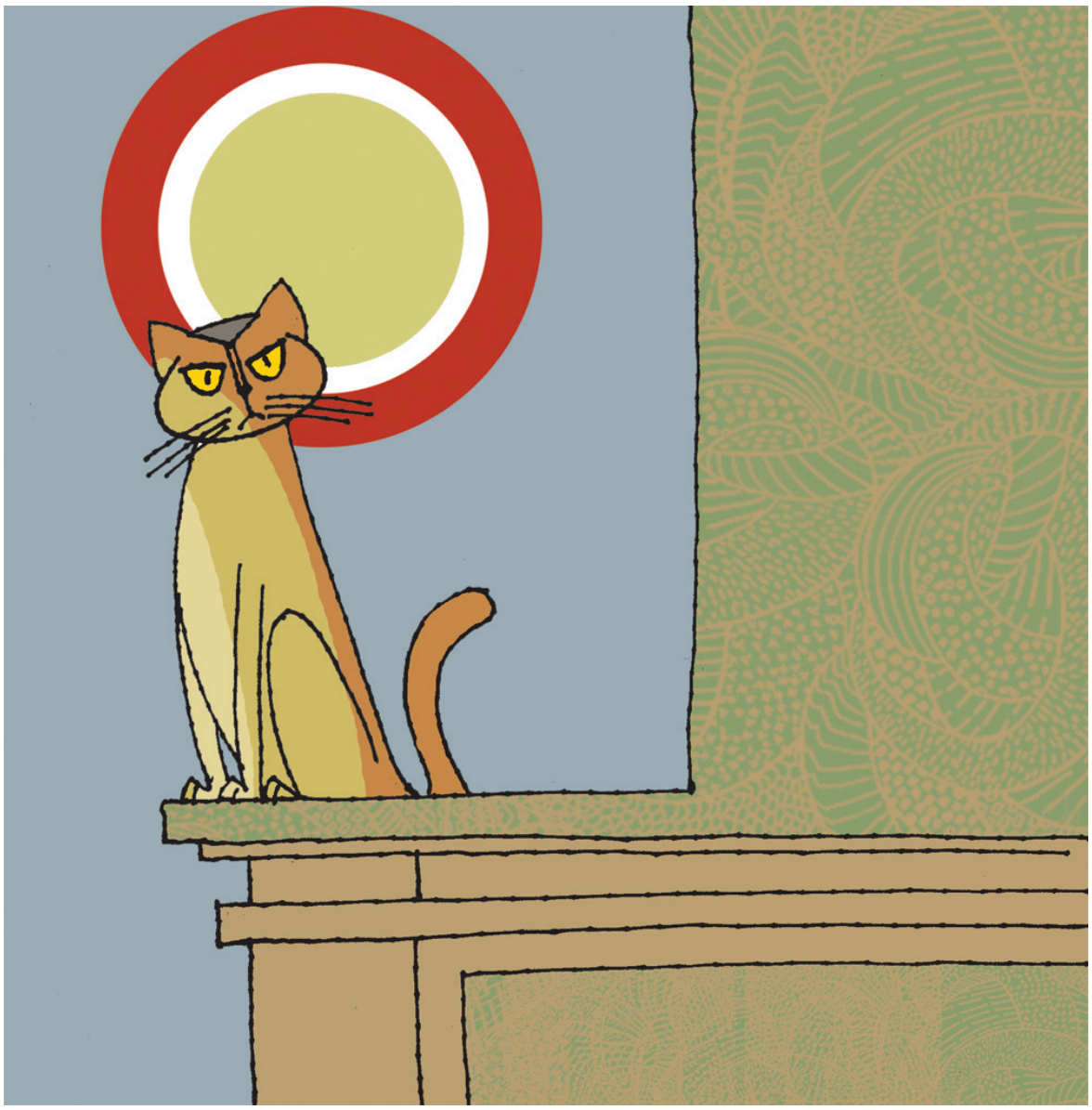

একটা গলি, বিশেষত্ব নেই, কলকাতার গলিপথ যেমন হয়। দুই ধারে ঝুলে থাকা বাড়ি, দোতলা, তিনতলা, এ ওর গা ঘেঁষে, দখলীকৃত উদ্বাস্তু এলাকায় বাড়ি যে ভাবে ওঠে। সে সব বাড়ির আগুপিছু স্যাঁতস্যাঁতে গ্রাউন্ডফ্লোর, মূলত ড্যাম্প, জলছাপ, নোনাধরা দেওয়াল এবং কেঁচো ওঠা বাথরুমের সমন্বয়। সে সব একতলায় ভাড়াটেরা থাকে দুই-এক প্রজন্ম নির্ঝাঞ্ঝাটে, অথবা গজিয়ে ওঠে মেস।

এ গলি এমনিতে মন্দ নয়। কর্পোরেশনের দয়ায় আপাদমস্তক বাঁধানো কংক্রিট, খানিক দূরত্ব রেখে একটেরে ল্যাম্পপোস্ট, ইতি-উতি চাকলা ওটা ইটের পাঁজরে টাইম কল। রাস্তায় এক ফোঁটা সবুজের চিহ্ন নেই, যদিও সামর্থ্য অনুযায়ী ছাদ থেকে ঝোলে অ্যালামণ্ডা, ঘৃতকুমারী, কাগজি লেবু, কুব্জা ক্যাকটাস। বাম হাতের সব ক'টি বাড়ির একতলাতেই মেস, যেহেতু রোদ ঢোকে না এক ছটাকও। আবার ডান হাতের বাড়িগুলি বোঝাই ভাড়াটেতে, কেন না সাড়ে এগারোটা থেকে দেড়টা সে সব বাড়ির চৌকাঠে একফালি রোদ আসে মেসির ফ্রি কিকের মতো তেরছা। বিনামূল্য নয় অবশ্য, রোদ কিনতে দু'চার হাজার নগদ বেশি পড়ে, মেসের সাধ্যে কুলোয় না। সুদূর মফস্সল বা উঠতি গঞ্জ এলাকা থেকে ফি বছর কাতারে কাতারে ছেলে-পুলে ভিড় জমায় মহানগরে। তারপর চেনা লোকজন, বন্ধু বা দালাল ধরে ভিড়ে যায় এইসব খাটালসদৃশ মেসে। এককালের বর্ধিষ্ণু, পরে ছিন্নমূল, শেষে কলোনি গড়ে তোলা বাড়িওয়ালারা জীবনে দেখেছেন প্রচুর। অভিজ্ঞতা তাঁদের শিক্ষা দিয়েছে, প্রথমত মানবিকতা বলে কিছু হয় না। দ্বিতীয়ত, দায়ে পড়লে মানুষ এবং গরু সহাবস্থান করে। তৃতীয়ত, অসহিষ্ণু ছাত্রজীবনে মাপসই আদর্শ খুঁজে নিতে অপাচ্য অন্ধকার এবং ল্যাম্পপোস্টের বিকল্প নেই।

বেশ দুপুর। দাঁড়িয়েছিলাম মেসের বারান্দায়। যে ভাবে উল্টোদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন বৃদ্ধা মহিলা। দু'জনেই গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম একটা হৃষ্টপুষ্ট বিড়ালশিশুকে। জানুয়ারির শীতে মহাসুখে লেজ গুটিয়ে সে কায়দা করার চেষ্টা করছিল একটি সদ্য অপহৃত মাছের টুকরো। টুকরোটি সাইজে বিলক্ষণ বড়, অন্তত ততটা বড়ো যা নিয়ে একবেলা মারপিট লাগতে পারে মেসে, অধিকারের প্রশ্নে ব্লেড চালিয়ে ভাগ হতে পারে অতিরিক্ত মাছের অংশ। স্বভাবতই খাওয়ার সময় এই সাইজের একখানি মাছ অনেক বেশি সম্মান দাবি করে। নিখুঁত ফোরপ্লের মতো হালকা আঙুলে কাঁটা বেছে খুলে নিতে হয় তার নরম শরীর। মাখিয়ে নিতে হয় ভাতের সঙ্গে। তারপরে কন্ডোমের মডেলদের মতো লাস্যময় চোখের এক্সপ্রেশনে ঠেলে দিতে হয় দাঁতের ফাঁকে। বিড়াল অবশ্য সে লাস্যের ধার ধারছিল না। বরং মাছটা নিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল বাসররাতের কামার্থ যুবকদের মতো। খামচাচ্ছিল, কামড়াচ্ছিল, ঠেলছিল, কুলিয়ে উঠছিল না, ফের প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল টুকরোটির উপর। বিড়ালছানার কাণ্ড দেখতে দেখতে বৃদ্ধা বললেন, 'এইটুকু বয়সে কী আর মাছ খেতে পারে?' মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলুম, যদিও কস্মিনকালে বিড়ালকে বিস্কুট খেতে দেখিনি আমি। বাড়িতে বিড়াল ছিল না, আদিখ্যেতার পাঠও ছিল না, চিরকাল পেটাবার জিনিস বলেই মা ষষ্ঠীর বাহনটিকে চিনে এসেছি। দেখলেই চ্যালাকাঠ নিয়ে তাড়া করেছি, লাথি মেরেছি, নিদেনপক্ষে ইট ছুড়েছি। এখনও যেমন হাত নিশপিশ করছে আমার। পাকড়ে ধরা তেলোর চাপে ভেঙে আসছে গ্রিলের জংধরা মরচে। বিড়ালটা স্বাধীন জেনানার মতো রোদ পোহাচ্ছে, খেলেছে, লাফাচ্ছে, এ সব মোটেই সহ্য করা যায় না।

স্নান করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে যা দেখার প্রত্যাশা ছিল, তাই দেখলাম। বৃদ্ধা বিড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়ে দোল দিচ্ছেন। আদর করে মুলে দিচ্ছেন কান, বিলি কেটে দিচ্ছেন লোমশ শিরদাঁড়ায়, এরপর নিশ্চিত দুধ-বিস্কুট খাওয়াবেন। মহিলার এই স্বভাব। শুধু আজ নয়, দু'বছর ধরেই দেখছি রাস্তার কুকুর-বিড়াল-ছাগল নিয়ে ওঁর প্রবল আদেখলাপনা, হামলে পড়েই আদর করেন প্রায়। মেসে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একদিন। পার্থ পুরোনো বোর্ডার, হাই তুলে বলল, 'বিড়ালই ভরসা ওঁর। ছেলে তো টাকা নিয়ে ভেগেছে।' জানা গেল, স্বামী সরকারি কর্মচারী ছিলেন, উঁচু পদেই কাজ করতেন এবং কাজের বাইরে সুবিধে নিতে কার্পণ্য করতেন না। ফলে জমানো টাকাকড়ি-পেনশন-গ্র্যাচুইটি-প্রফিডেন্ট ফান্ড মিলিয়ে মরার আগে বউ এবং একমাত্র পুত্রের জন্য অনেক কিছুই রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু সবেধন পুত্র সেই বিচক্ষণ জিন ধরে রাখতে সমর্থ হয়নি। একের পর এক হঠকারী ব্যবসায়িক ভেঞ্চারে যাবতীয় অর্থের শ্রাদ্ধ করে বউ-বাচ্চা নিয়ে আপাতত শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই সে। মাথার উপর ছাদখানা স্বামী পোক্ত করে গিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলের দেনায় চিলেকোঠা অবধি ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। দোতলাটা বেচে কোনওক্রমে একতলাতে বৃদ্ধা টিকে আছেন। সে-ও ভরসাযোগ্য কিছু নয়। ফি হপ্তায় এভিকশন নোটিস আসে শহর জুড়ে পাতলা বৃষ্টির মতো।

বিকেলবেলা। জল নিতে গিয়েছি টাইমকলে। মহিলা দাঁড়িয়ে পাঁচ লিটারের ড্রাম হাতে। পৌরসভার বদান্যতায় ঝিরিঝিরি জলস্রোত, গ্রীষ্মের লুনী, মাঝেমাঝেই থমকে যায় বাতাসি অবোধ্যতায়। পর পর সার দেওয়া বালতি-বোতল, আগু-পিছু হুড়োহুড়ি, ধৈর্যের চরম পরীক্ষা। মাপা হিসেবের জল, একফোঁটা বাড়তি নেওয়ার সুযোগ নেই, তবু রোজই কেউ না কেউ ফিরে যায় শূন্যহাতে। আগন্তুকে উপচে পড়া বহুপ্রসবিনী শহর, তদুপরি কংক্রিটের জঞ্জাল। মাটি খুঁড়লে যে জল মিলবে না, এটাই দস্তুর। সবাই মেনে নিয়েছে এটাই ভবিতব্য, তবু মূক অভিযোগ গুঞ্জরিত হয়েই চলে মুখুজ্যেদের বিধবা কালো মেয়েটির মতো। হয়তো বা ব্যর্থ আস্ফালনে শুশ্রূষা মেলে অসহায়ত্বের।

এদিকে মহিলা ফের পড়েছেন বিড়াল নিয়ে। বিড়ালটি হেলেদুলে চলেছে পাশের দোতলা বাড়ির সুরম্য কার্নিশে, লঘুপায়ে, ভ্রূক্ষেপহীন। নীচ থেকে মহিলা প্রবল উৎকণ্ঠায়, থেকে থেকেই নির্দেশ দেন, 'দেখে চল মা, লাফাস না, চুপ করে বোস।' ইতর জীব গ্রাহ্য করে না, তিড়িং-বিড়িং লাফায়, ঝাঁপ মেরে গ্রিল ধরতে গিয়ে ফসকায়, নখ আঁকড়ে ঝুলতে থাকে উল্লম্ব শূন্যতায়। মহিলা নীচ থেকে হাঁক-পাক করেন, 'বলেছিলাম, অত উপরে উঠিস না, মাথা ঘুরবে। হল তো এখন।' বিড়াল কিন্তু দিব্যি সামলায়, নির্মেদ পাঁচ ইঞ্চির গাঁথুনিতে ডিগবাজি খায়, উঠে পড়ে প্রতিবেশীর প্রশস্ত জানলায়। ঝরা শিউলির মতো সন্ধে আসে গলির মোড়ে। চাপ চাপ অন্ধকারে তুলসীমূলে জ্বলে ওঠে চৈনিক টুনি বাল্‌ব। অপচয়ের জল ছাপিয়ে নামে বিসলেরি বোতলের গা বেয়ে।

দু'একদিন পরের কথা। অলস দ্বিপ্রহর। ঝিমধরা পাড়ায় ফেরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে, 'পালিশ করুন, শানিয়ে নিন'। সামনে ধরা লোহার পাত, ভেজা পাথর। সেখানে চেপে ধরে ঘষলেই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে ভোঁতা বঁটির স্থূল দাগ, জেগে ওঠে কাটারির লোহাঘুম। এ লোকের বাড়ি দক্ষিণের গাংমোহনায়। চমৎকার হাতের কাজ, সূক্ষ্ম এবং টেকসই। সেইসঙ্গে সে বয়ে আনে পাঁচমেশালি কাজের জিনিস, সংসারের খুচখাচ প্রয়োজনে ঠিকই লেগে যায় এর কিছু না কিছু। ট্রেন উজিয়ে সাত-আট মাসে সে এক-আধবারই ভেড়ে

মহিলা প্রবল উৎকণ্ঠায়, থেকে থেকেই নির্দেশ দেন, 'দেখে চল মা, লাফাস না, চুপ করে বোস।' ইতর জীব গ্রাহ্য করে না, তিড়িং-বিড়িং লাফায়, ঝাঁপ মেরে গ্রিল ধরতে গিয়ে ফসকায়, নখ আঁকড়ে ঝুলতে থাকে উল্লম্ব শূন্যতায়। মহিলা নীচ থেকে হাঁক-পাক করেন, 'বলেছিলাম, অত উপরে উঠিস না, মাথা ঘুরবে। হল তো এখন।' বিড়াল কিন্তু দিব্যি সামলায়, নির্মেদ পাঁচ ইঞ্চির গাঁথুনিতে ডিগবাজি খায়, উঠে পড়ে প্রতিবেশীর প্রশস্ত জানলায়